চতুর্ব্বর্গ

শিবপ্রসাদ রায়

লেখক পরিচিতি

অধ্যাপক সুকুমার চন্দ্র। জন্ম আসানসোলের কাল্লা সেন্ট্রাল হসপিটাল কলোনীতে ১৯৬৯ সালে। স্কুল জীবন রামকৃষ্ণ মিশন হাইস্কুল থেকে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াতে না গিয়ে, পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। ১৯৯০ সালে স্নাতক আসানসোল বি.বি.কলেজ থেকে। ১৯৯২ সালে প্রথম বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পান বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। মাইক্রোওয়েভ নিয়ে এম.ফিল. করেন ১৯৯৩ সালে। তারপর নর্থ পয়েন্ট সিনিয়র সেকেন্ডারী স্কুল, বাগুইহাটি, কলকাতায় কিছুদিন শিক্ষকতা করে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন-এর অধীনে গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগদান করেন। ১৯৯৬ সালের জুলাই মাসে স্বরাষ্ট্রদপ্তরে আধিকারিক পদে যোগদান হেতু দিল্লীতে থাকা শুরু হয়। প্রায় পাঁচ বৎসর দিল্লীর বিভিন্ন কোম্পানী সার্ভে করে খুঁজে পান ইন্টারভিউতে সফল হতে গেলে একজনের কি কি গুণাবলী দরকার। ফেব্রুয়ারী ২০০১ সালে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে যুক্ত হন। কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য হওয়ার সাথে সাথে ক্রীড়া বিভাগ এবং অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ পদ বারবারের দায়িত্ব তিনি পালন করে চলেছেন। N.C.C. করানোর সুবাদে প্রতিরক্ষা দপ্তরের অধীনে লেফটেন্যান্ট (Commissioned Officer) পদের ভূমিকাও পালন করছেন। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিভাগের অতিথি শিক্ষক হিসাবেও তিনি এক পরিচিত নাম। এছাড়া IIT Kharagpur এও তিনি গবেষণারত।

শিবপ্রসাদ রায়

প্রাপ্তিস্থান

প্রকাশক ঃ
তপন কুমার ঘোষ
৫, ভুবন ধর লেন
কলকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ মহালয়া, ১৪১৫

মুদ্রণ ঃ
মহামায়া প্রেস অ্যান্ড বাইন্ডিং
৩০/৬/১, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

মূল্য ঃ ৩.০০ টাকা

এই লেখকের অন্যান্য রচনা

সময়ের আহ্বান
আমি স্বামীজি বলছি
অনুপ্রবেশে বিনাযুদ্ধে ভারত দখল
দিব্যজ্ঞানদায় কাণ্ডজ্ঞান চাই
বঙ্কিমচন্দ্র / তিন বিঘা নিয়ে
আমরা ও তোমরা
ছাগলাদ্য নেতৃত্ব এবং কাশ্মীর
আসুন সবাই মিলে আর এস এসকে খতম করি
নস্ত্রাডামাসের সেঞ্চুরী ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ
সর্বধর্ম সমন্বয়কারী হইতে সাবধান্
বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা
ধর্ম নিয়ে দু'চার কথা
দর্পণে মুখোমুখী
রহস্যময় আর এস এস
চলমান ঘটনা বহ্নিমান পর্বত
রক্তে যদি আগুন ধরে
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে বজ্জাতি
ক্রুশ বাইবেলের অন্তরালে
দেশে দেশে জয়যাত্রা
আর এক সুকান্ত
হাসির চেয়ে কিছু বেশী
শয়তানেরা ঘুমোয় না
বুদ্ধিজীবী সমীপেষু
We want Babri Maszid
মারমুখী হিন্দু

প্রগতির বিরুদ্ধে

প্রগতি শব্দটির এদেশে বহুল ব্যবহার। প্রগতি মানে অগ্রগতি। সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। প্রত্যেকের কথাবার্তায় একটা এগিয়ে যাবার ভাবও দেখা যায়। অবশ্য পুচ্ছ প্রগতি বলেও একটা শব্দ প্রচলিত আছে। পুচ্ছ প্রগতি মানে পিছন দিকে অর্থাৎ লেজের দিকে এগোনো। অনেকেই বলে থাকেন এখন দেশে চেতনা বেড়েছে কতো। যদি প্রশ্ন করা যায় চেতনা বেড়েছে না দুর্নীতি ? উৎসাহী বক্তা নির্বাক হয়ে যান। সত্যি আমরা কোন্‌দিকে এগোচ্ছি তা একটা রীতিমত বিতর্কের বিষয় হতে পারে। বিতর্কের উর্দ্ধে কিছু কিছু বিষয় নজরে পড়ে। সিগারেট খাওয়া শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর এই বিজ্ঞাপন পড়তে পড়তে নির্বিকারে সিগারেট খাওয়া প্রগতিশীলতার অন্যতম লক্ষণ। উগ্রতা, রুক্ষতা, যুক্তিহীনতাই সেই প্রগতির উৎপত্তিসূত্র, উদ্ভট কথা বলা এবং কাজ করা যেন প্রগতির বিকাশের স্তর। একটা উদ্দাম বল্গাহীন জীবন কাটাতে গিয়ে মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করা প্রগতির পরিণতি। সেটা জোরে মোটর কিংবা মোটর সাইকেল চালাতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্টও হতে পারে। মাত্রাধিক ধূমপান কিংবা ট্রাঙ্কুলাইজার এডিকটেড্ হয়ে ইন্সিডেন্টও।

ভীড় দেখলেই জোরে সাইকেল চালিয়ে কসরৎ দেখানো, মেয়ে দেখলে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী মন্তব্য এবং সিটি মেরে জেনুইন 'সিটিজেন' রূপে নিজেদের চিহ্নিত করাও প্রগতিশীলতা। কয়েকজন সমবয়সী বন্ধু থাকলে অনর্গল খিস্তি এবং পরস্পরের বাবা এবং মাকে নিয়ে সরস অশ্লীল উক্তি অনেক যুবক বেশ প্রগতিশীল কাজ বলে মনে করে। বাড়ীতে অনেক জরুরী কাজ থাকা সত্ত্বেও সারাদিন শুধু বিড়ি চা তাসখেলা ক্রিকেট ফুটবল নিয়ে অহেতুক উত্তেজিত হওয়াও বোধ হয় প্রগতি। পুরোন যেসব মূল্যবোধ সমাজটাকে

ধরে রেখে দিয়েছিল, শিষ্টাচারে শ্রদ্ধাবোধে একটা শৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল, প্রগতিশীলদের কাছে সেগুলো শৃঙ্খল মনে হচ্ছে। ফলে যা কিছু পুরানো, যা আগে হয়েছে তাকে ব্যাকডেটেড্ বলে, প্রতিক্রিয়াশীল বলে আঘাত করা প্রগতিশীলদের একটি অবশ্য করণীয় কর্তব্য। বাবা সেকালের গ্রাজুয়েট, ছেলে একালের ইডিয়েট, তবু ছেলে ভাববে বাবা কি আমাদের মতো এ যুগের যন্ত্রণা বোঝে নাকি! এদের কাছে সূর্য্য পুরানো সুতরাং এটা প্রতিক্রিয়াশীল, ওটা নিভিয়ে দেওয়া দরকার। টিউবলাইট আধুনিক অতএব প্রগতিশীল, ওটা জ্বালিয়ে দাও। বাতাস কোন যুগ থেকে বইছে, তাই ওটা প্রতিক্রিয়াশীল, ওটা বন্ধ করা প্রয়োজন। ফ্যান হালফিল এসেছে অতএব প্রগতি, ওর ব্যবহার দরকার। এদের কাছে জন্ম আগে বলে সেটা প্রতিক্রিয়াশীল, মৃত্যু পরে তাই মৃত্যু প্রগতিশীল। তাই প্রগতির নামে এক সার্বিক মৃত্যুর চর্চা চলছে এদেশে। এদেশের একদা শ্লোগান ছিল মাতৃবৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ। পরনারীকে মাতৃতুল্যা মনে করতাম; পরের দ্রব্যকে মৃত্তিকাখন্ড তুল্য। এগুলো প্রতিক্রিয়াশীল বলে পরিত্যক্ত হয়েছে। গণধর্ষণ, ব্যাঙ্ক ডাকাতি বেশ প্রগতিশীল জিনিষ। এগুলো সমাজে গৃহীত হয়েছে। 'পিতৃ দেবো ভব, মাতৃ দেবো ভব' ছিল এদেশের শিক্ষা। মা-বাবাকে প্রত্যক্ষ দেবতারূপে ভাবানো হত। জ্যেষ্ঠদের সামনে সংযত হওয়া, শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটানো, এগুলো ছিল অভ্যাস। প্রতিক্রিয়াশীল বলে এসব অভ্যাস ত্যাগ করা হয়েছে। প্রগতিবাদীদের কাছে পিতা উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র। কামনার আবেগে আমাদের জন্ম দিয়ে যে পিতা আমাদের হাজার গন্ডা সমস্যার সম্মুখীন করে দিয়েছে, তাকে শ্রদ্ধা করার কোন প্রয়োজন নেই। বরং কৈফিয়ৎ চাওয়া উচিৎ জন্ম দিয়েছিলে কেন ? এখন দায়িত্ব পালন কর। মায়ের প্রতি কিছু দুর্বলতা দেখানো যেতে পারে। হাজার হলেও দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করেছিলেন। একটা গোডাউন চার্জ বলেও তো কিছু আছে ? শ্রদ্ধাবোধ

পুরোনো প্রতিক্রিয়া বলে বর্জিত হয়েছে অনেকদিন। এখন বড়দের অসম্মান অবমাননা করার মধ্যে প্রগতিশীলরা একটু বিশেষ আনন্দ অনুভব করে থাকে। টেকো বৃদ্ধ পেলে তার মাথায় তবলা বাজিয়ে দেওয়া প্রগতির মধ্যে বড়ো। এক ব্যক্তি বড় বেদনার সঙ্গে তার নিজের অভিজ্ঞতা জানালেন, জানেন অন্ধকারে মাঠে বসে আছি আমারই ছোট ছেলে এসে বল্লে, দাদু দেশলাই আছে নাকি ? মুখ ঘুরিয়ে আমি তাকে দেশলাই দিলাম। আমি বাবা বুড়ো হয়েছি বলে অন্ধকারে দাদু হয়ে গেলাম। আমার ছোটবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। একটা ফলের দোকানে একজন অজ্ঞ ক্রেতা বলল ডালিমের তুলনায় বেদানার দাম এত বেশী কেন ? ডালিম শুকিয়েই তো বেদানা হয়। দোকানদার বলছিল তাই কি হয় ? বাবা বুড়ো হয়ে গেলে কি আপনি দাদু বলবেন ? সেদিন রসিকতা মনে করেছিলাম। আজ প্রগতি বেড়েছে তাই কথাটা সত্যি হয়ে দাঁড়ালো। পার্লামেন্টে এখন একটা আইন পাশ করাতে পারলে প্রগতিশীলদের অনেকটা সুবিধে হয়। প্রস্তাবটা হচ্ছে যে চল্লিশ পেরিয়ে যাওয়া বাবাদের বাবা বলা চলবে না। দাদু বলতে হবে। এমন একদিন ছিল যেদিন বড়দের কাকা জ্যাঠা মেসোমশাই বলে সম্বোধন করা হত। ওগুলো প্রগতির বাধা বলে এখন এক অখন্ড সম্বোধন দাদু। বাবা সম্বোধনে আছে সঙ্কোচ। সব কথা প্রাণ খুলে বলা যায় না। মাল খাবার পয়সা চাওয়া যায় না। গার্লফ্রেন্ডদের নিয়ে এসে সোজাসুজি প[illegible] প্রত প্রশাসক। করিয়ে দিতে দ্বিধা হয়। সিগারেট ধরিয়ে নিভিয়ে দিতে হয়। এরজন্য [illegible] দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। বড়ো শহর থেকে ছোট শহরে এই প্রগতি পৌঁছতে সামান্য দেরী। পিতাপুত্রে ধূমপান মদ্যপানের প্রগতি বহু স্তরে এসে গেছে। দাদা তার বন্ধুদের সামনে বোনকে বসিয়ে বোনের বুকের কোমরের মাপ নিয়ে ফিগার নিয়ে আলোচনা করছে নির্বিকার চিত্তে। সুতরাং প্রগতির মধ্যপথে দাঁড়িয়ে যাঁরা অস্বস্তি বোধ করছেন তাঁদের আশংকা

অমূলক, অল্পদিনেই পূর্ণ প্রগতি তাদের গ্রাস করবে। প্রতিক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে। বিবেকের আলো বিবেচনার শক্তি এখনো কিছু আছে বলেইতো ভালোমন্দ আলো অন্ধকার প্রগতিশীল প্রতিক্রিয়াশীল। ওই আলোটা কোন প্রকারে নিভিয়ে দিতে পারলে সবটাই প্রগতি। সেই প্রগতির দিকে গোটা দেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সমাজপক্ষীর দুটি ডানাই ঝটপট করছে অনেকদিন থেকে। একটি পুরুষ একটি নারী।

মেয়েরা প্রগতি বলতে বুঝে নিয়েছে পুরুষের সঙ্গে যথেষ্ট মেলামেশা, যতোদূর পর্য্যন্ত সম্ভব শরীরটাকে পিনপয়েন্ট এবং উদোম করে প্রদর্শন করা। উদ্দেশ্য পুরুষদের প্রথম রিপুটিকে শানিত করে তাদের প্রগতিশীল করে তোলা। অর্থাৎ ধর্ষণকারী হতে উদ্বুদ্ধ করা। যাঁরা বিবাহিতা তাঁরাও পুরুষ সংসর্গ সহজে ঘটার আশায় সাজেন প্রায় কুমারী। স্বামী যে আছেন সেটা বুঝতে হয় গোয়েন্দার সন্ধানী দৃষ্টিতে। বাঁকানো সিঁথির কোণে অবহেলার সঙ্গে একবিন্দু সিঁদুর দেখে। এগুলো প্রগতির চিহ্ন। সতীত্ব-শুচিতা--পবিত্রতা-নম্রতা এসব প্রতিক্রিয়াশীল বলে বর্জ্জিত। সন্তানকে দুগ্ধবঞ্চিত করে হোক না ব্রেষ্ট ক্যান্সার, তাই বলে পরপুরুষের লুব্ধ দৃষ্টিকে বঞ্চিত না করাই প্রগতি। আজকাল যেখানে সেখানে মেয়েদের শ্লীলতাহানি অসম্মানের পিছনে শুধু প্রগতিশীল ছেলেদের ভূমিকাই সব নয়, প্রগতিশীল মেয়েদের প্রকোপও যথেষ্ট। দুটি প্রবল প্রগতি একত্রিত হলে একটু দুর্গতি হবে বৈ কি।

ত্যাগ কর্ম্মপ্রগতি যাতে কোথাও বাধাপ্রাপ্ত না হয় তার জন্য অসংখ্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল রয়েছে। পুরানো বলে প্রতিক্রিয়াশীল বলে এরা দলের মধ্যে চরিত্র, শৃঙ্খলা, ঐক্যের বিন্দুবাষ্পও অবশিষ্ট রাখেনি। তাই গণধর্ষণই হোক আর চুরি-ড়াকাতিই হোক, সকলের পাশে দাঁড়িয়ে লড়বার জন্য সংগ্রামী প্রগতিশীল দল এদেশে আছেই। ছাগল চুরি করে চোর ধরা পড়ুক। পুলিশ ধরে নিয়ে যাক। সঙ্গে সঙ্গে থানা ঘেরাও। বক্তৃতা শোনা যাবে ঃ বন্ধুগণ এই

তরুণ নেতা আমাদের পশুমুক্তি সেলের সম্পাদক। একে ছাগল চোর বলে ধরে এনে পুলিশ মহান পশুমুক্তি আন্দোলনকেই কলঙ্কিত করেছে। থানায় বসে বসে কর্তৃপক্ষ হাসে। আগে চোরকে চোর বলে ধরে এনে পেটানো তারা কর্ত্তব্য বলে মনে করত, এখন গরুচোরকে ভরে এনে দেখা যাচ্ছে তিনি পশুমুক্তি আন্দোলনের নেতা। পুলিশের কাছেই তখন কৈফিৎ চাওয়া হয়। এই সব দেখে এখন পুলিশও প্রগতিশীল হয়ে গেছে। দেখে শুনে ধরে। কিছু স্বাধীন মনস্ক অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াশীল পুলিশ অফিসার অনেক প্রগতিশীলকে বিপাকে ফেলে দেন। নিজেরাও তার জন্য অসুবিধায় ভোগেন। আর একদল প্রগতিশীল জীব আছে এই দেশে, এরা হল তরুণ লেখক গোষ্ঠী। এদের মধ্যে কবি গল্পকার প্রাবন্ধিক সকলেই আছে। এদের ভাবে ভঙ্গীতে রোমান্টিকতা তন্ময়তা এবং ইনটেলিজেন্স মাখানো। এদের অনেকেই প্রতিবেশিনী কিংবা সহপাঠিনীকে দু-একটি কথা বলতে চেয়েছিল, পারেনি কিংবা মেয়েটা শোনেনি। সেই অবরুদ্ধ কামনা কাঁধে দাদের মতো প্রকাশিত হতে থাকে গল্প কবিতায়। এসব লেখা কেউ পড়ে না। নিজেরাই পড়ে আর কস্তুরী সেই মৃগ আমি নিজের গন্ধে নিজেই মরি, ভাব নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আত্মপ্রচার আর প্রগতিশীল হবার ক্ষণতৃপ্তিতে যৌবনের কত যে স্বর্ণসময় এরা অপচয় করে। শুধুই কি কবি সাহিত্যিকদের জীবনের অপচয়। রাজনীতি এবং ধর্মের নামে যে প্রগতিশীল যুবকেরা যুক্ত, তাদেরও একই হাল। দ্রুত এবং সঠিক সিদ্ধান্ত যারা নিতে পারে তারা নেতা হয় কিংবা ভালো প্রশাসক। তেমনি যুক্তিবুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে যিনি ভাবনা চিন্তা করতে পারেন, দায়িত্ব কর্তব্য পালন করে থাকেন, তাকেই আমরা প্রগতিশীল মনের অধিকারী বলতে পারি। চেতনার জগতে এই উন্নত উর্দ্ধমুখীনতা কোথায় কতটুকু আছে ? থাকলে মাথামুন্ডুহীন হিন্দী সিনেমার কাছে কোটি কোটি মানুষের আত্মসমর্পণ এত সহজে সম্ভব হত না। আসলে দায়িত্বহীন

উত্তেজনাকে আমরা প্রগতি বলে ভাবতে শিখেছি। কোন রকমে টিকিটটি কাটা, আর কিছু করার নেই। যা করার সে তো ধর্মেন্দ্র হেমামালিনীরা করবে। লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ক'টি লোক ক্রিকেট খেলবে, আর তাই নিয়ে উত্তেজনার আগুন পোহাবে কোটি কোটি মানুষ। ফুটবলে আর একটু বেশি। ব্লেড চালানো ছুরি চালানো পর্য্যন্ত প্রগতির পরাকাষ্ঠা। রাজনৈতিক চেতনা? আমার কি দরকার? আমার গ্রুপ্র লিডার আছে না? তিনি যেদিকে আমি সেদিকে। আধ্যাত্মিক সচেতনতা? আমার কিছু করার নেই। গুরু ঠিক চালিয়ে নেবেন। এক অদ্ভুত চৈতন্যশূন্যতা যুক্তিহীনতা বা নির্বুদ্ধিতাকে আমরা বলছি প্রগতি। এই প্রগতির জয়জয়কার চতুর্দিকে। তাই জীবনের কোন ক্ষেত্রে আর মাধুর্য্য চোখে পড়ে না। চারিদিকে শুধু কদর্য বিভীষিকা স্থূলতার হুহুংকারে আজ সব কমনীয়তা, সূক্ষ্মতা, কোমলতা বিলুপ্তির পথে। তাছাড়া সবরকম প্রগতিশীলদের সবসময় প্রেরণা দেবার জন্য আছেন বেশ কিছু মহাপুরুষ। মার্ক্স বলেছেন ঃ সর্বহারাদের শৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছু হারাবার নেই। শৃঙ্খল মানে বন্ধন। নানারকম সামাজিক, নৈতিক বন্ধনে একটা মানুষ, মানুষ থাকে। শোষণের বন্ধন, নিশ্চয়ই চূর্ণ করা উচিত। কিন্তু অন্যান্য বন্ধনগুলো শিথিল করলে কি হয় ? তার প্রমাণ থাকে পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক প্রগতিশীল পত্রিকা গণশক্তিতে। প্রথম পাতার দুটি কোণে যেখানে বাণীতে শোভিত হতেন স্ট্যালিন, লেনিন। আজ সেখানে বিজ্ঞাপন বিরাজিত ফেমিনা এবং বোরোলিন। স্ট্যালিন লেনিনের শূন্যস্থান পূরণ করছে ফেমিনা, বোরোলিন। প্রগতিশীলতায় চক্ষুলজ্জা থাকে না। তাই এই পরিবর্তন। লেনিন বলেছেন ঃ কামেচ্ছা তৃষ্ণার মতো, ওটা যেখান থেকে খুশি মিটিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এই বাণী ধর্ষণকারীদের কতো প্রেরণা দিতে পারে। হাবিব তনবীর নামে এক প্রগতিশীল নাট্যকার কলকাতায় এসে একটা নাটক করে গেলেন। নাটকের বিষয়, একশো ছাব্বিশতম বিবাহের রাত্রে ছেলে মাকে

বলছে হাজার বিয়ে দিয়েও তুমি আমাকে সুখী করতে পারবে না মা, আমি তোমাকে চাই। এই বিকৃত অসুস্থ, অশ্লীল নাটককে এক প্রগতিশীল দৈনিক আখ্যা দিল মাতাপুত্রের সম্পর্ক নিয়ে দুঃসাহসী নাটক।

উৎপল দত্ত মহাভারতে না থাকা সত্ত্বেও লিখলেন দ্রৌপদী কীচকের প্রতি আসক্তা। সরোজ মুখার্জী বললেন বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক। রবীন্দ্রনাথ বিপ্লব বিরোধী বা প্রতিবিপ্লবী। এবাদৎ হোসেন লিখলেন, রাজা রামমোহন রায় ইংরেজের দালাল ছিলেন। অর্থাৎ যা কিছু সৎ, শুভ্র, সুকুমার তাকে নির্দয়ভাবে ধ্বংস করাই হচ্ছে প্রগতিশীলতা। নাগরিক সভ্যতায় বিরক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ একদা দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, দাও ফিরে দাও সে অরণ্য কেড়ে লও এ নগর। রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা লক্ষগুণ বিরক্ত হয়ে আমি বলছি, হে বিধাতা কেড়ে নাও এই প্রগতি। ফিরিয়ে দাও সেই প্রতিক্রিয়াশীলতা, যা মানুষকে জীবন বিরোধী নয়, জীবনমুখী করবে। আত্মহনন নয়, আত্মোপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ করবে।

অগ্রগতির বাধা

রাজনীতি নিয়ে লিখবো না কারণ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষেত্র এখন উত্তেজনাশূন্য। বিরোধীপক্ষের যদি যক্ষ্মা হয়ে থাকে তবে শাসকপক্ষ আক্রান্ত কর্কট রোগে। সুতরাং এহো বাহ্য। অধিকাংশ মানুষের জীবনে যা আজ প্রত্যহের উত্তেজনা এবং উৎসাহের বাহন, তাই হোক লেখার প্রতিপাদ্য। "লটারী এবং ভাগ্য।" দৈনন্দিন জীবনে লটারী যেন জড়িয়ে গেছে, হয়ে উঠেছে অপরিহার্য্য। বহু বাড়ীতে বাজারের তালিকাএই ভাবে নির্ণীত করেন গৃহিনীরা—তেল এনো, চালও ফুরিয়েছে। শুলটা যাবার সময় বলে যেও, আর আজকে স্কিম বাম্পারের খেলা। তিন সিরিজের তিনটে টিকিট আনবে। বেশী নেবেনা। লোভ-দ্বন্দ্ব-সংশয়-আশা-নিরাশা মনুষ্যমনের স্বাভাবিক উপাদান। কিন্তু শুধু স্বপ্ন মানুষকে শিথিল করে। কর্মে বিমুখ করে। ভাগ্যে বিশ্বাসী করে তোলে। কল্পনাবিলাসী, স্বপ্নদর্শী করে তোলে। এই শৈথিল্যের প্রতিরোধ দুর্গও গড়ে ওঠে মনের উর্বর জমি থেকেই। সেগুলো হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠা, শ্রমে আগ্রহ, দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, যুক্তিবুদ্ধির দীপ্তি। সব মিলিয়ে পুরুষোকার। আমাদের দেশে এই যুক্তিভিত্তিক আত্মবিশ্বাস শিথিল হয়েছে নানাকারণে। বর্তমানকালের এই যে লটারীর মহামারী এগুলো এসেছে কিন্তু জ্যোতিষীদের হাত ধরে। গত দশ বছরে এদেশে জ্যোতিষচর্চা হয়ে উঠেছে ব্যাপক। পথে ঘাটে সংবাদপত্রে এ্যামেচার, পেশাদার, রাজজ্যোতিষী, জ্যোতিষীসম্রাটদের ছড়াছড়ি। জ্যোতিষের বিরোধিতা করলেও লটারীর বিরোধিতা করা মুস্কিল। সেদিন এক ভদ্রলোক বললেন, আমাদের মতো গরীবদের আর কি ভরসা আছে বলুন? সি-পি-এম এতোদিন গরীব মানুষের একমাত্র ভরসা ছিল, আর নেই। এখন লটারীই একমাত্র ভরসা। যা কিছু স্বপ্ন সাধ এখন লটারীকে ঘিরেই। দেখা যাক ভাগ্যে কি আছে।

একটি হতভাগ্য দেশই এমন ভাগ্যচর্চায় উন্মত্ত হতে পারে। এই বিপুল ভাগ্যচর্চা একটা গোটা জাতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। শিক্ষিত মানুষ বিজ্ঞাপনের অধ্যাপক, সকালে খবরের কাগজে দেখলেন 'আজকের দিনটা কেমন যাবে।' দেখলেন মেষ রাশি, বাইরে বেরোলে বিপদ হতে পারে। কলেজ বন্ধ। গোটা জাতটাই মেষজাতিতে পরিণত হচ্ছে ধীরে ধীরে। অতীতকালেও আমাদের দেশে সর্বনাশ হয়েছে ঠিক এইভাবে। গ্রহ নক্ষত্রের উপর বিশ্বাসে এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব। বিদেশীরা সীমান্ত আক্রমণ করেছে। মহারাজা জ্যোতিষীদের ডাকলেন। জ্যোতিষীরা পুরোনো পাঁজি এনে খড়ি পেতে গুণে গেঁথে বললেন, মহারাজ আক্রমণতো হয়েছে, কিন্তু আপনি প্রতিরোধ কি করে করবেন, এখন যে মলমাস চলছে। রাজা নিশ্চিন্ত হয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে দাবা খেলতে লাগলেন। মাসখানেকের মধ্যে আক্রমণকারীরা বিনা বাধায় এসে ঘিরে ফেলল রাজবাড়ী।

মহারাজা অন্দর মহলে ডাকলেন জ্যোতিষীদের, এখন উপায়? জ্যোতিষীরা গুণে গেঁথে বললেন, মহারাজ আপনার উচিৎ এক্ষুনি আক্রমণ করা, কিন্তু কি করে আপনাকে যুদ্ধ করতে বলি, মাহেন্দ্রক্ষণটাই পাচ্ছি না যে। মাহেন্দ্রক্ষণ আর মলমাস দিয়ে গোটা দেশের সর্বনাশ ডেকে আনা হয়েছে। আক্রমণকারীদের কোন মলমাস ছিল না। সঙ্গে গলগ্রহরূপী কোন জ্যোতিষীও ছিল না। তাই তারা দাপটের সঙ্গে কয়েক হাজার মানুষ কোটি কোটি মানুষকে শাসন শোষণ করেছে হাজার বছর ধরে। শোনা যায় আঠারোজন অশ্বারোহীর আগমনে রাজা লক্ষ্মণ সেন পালিয়েছিলেন রাজজ্যোতিষীর পরামর্শে। বিবেকানন্দ স্নেহের সঙ্গে বলে গেলেন যদি কখনো তোমাদের হাত দেখাতে ইচ্ছা করে সোজা ডাক্তারের কাছে চলে যাবে, ষ্টিম্যুল্যান্ট কিছু ওষুধ খাবে। কটা দিন বিশ্রাম নেবে। আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং স্নায়বিক দৌর্বল্যই এই ব্যাধির ভিত্তি। সত্যি আমরা একবারও

ভেবে দেখিনা, যে দেশগুলো বিজ্ঞান নিয়ে তোলপাড় করে দিচ্ছে, চাঁদে যাচ্ছে , শুক্রে যাচ্ছে, তারা যদি বুঝত জ্যোতিষ একটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান, এর মধ্যে সত্য আছে, তাহলে রাশিয়া, আমেরিকা, বৃটেন, এতো কষ্টকর ট্রেনিং দিয়ে কে-জি-বি, সি-আই-এ, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড পুষতো না। এতো আধুনিকতম যন্ত্রপাতির আবিষ্কার করতো না। একগুচ্ছ জ্যোতিষী রেখে দিতো। তারা খড়ি পেতে বলে দিতো, কোথায় গাইডেড্ মিশাইল, কোথায় গুপ্ত টেলিস্কোপ, কোথায় অ্যাটমিক রিঅ্যাক্টার।

লালবাজারে প্রয়োজন হতো না দক্ষ গোয়েন্দাদের বিভাগ। ছক দেখে বলে দিত হত্যাকারী কোথায়? পাশ্চাত্য দেশগুলোয় হাসপাতাল তুলে দিয়ে আলমারিতে রেখে দিত পলা, গোমেদ, ঘোড়ার ক্ষুর আর অনন্তমূল। পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন অপ্রয়োজনীয় হয়ে যেত। জ্যোতিষী বস্তুটা যাই হোক বহু লোক এই নিয়ে করে খাচ্ছে, এরকম যুক্তি দিলে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু জ্যোতিষতত্ত্ব মানুষের জীবনে শান্তিশৃঙ্খলা রূপায়ণে সত্য নির্ধারণে যে সম্পূর্ণ অক্ষম তার স্পষ্ট প্রমাণ সর্বত্র। রাহু, কেতু বলে কোনো গ্রহের অস্তিত্বই নেই। অথচ তাদের প্রভাব পড়ছে মানুষের ওপর। ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো গ্রহ আবিষ্কার হয়েছে, তাদের প্রভাবের কথা কোন জ্যোতিষী বলেন না। গ্রহে গ্রহে ঠোকাঠুকি হয়ে ছিটকে পড়া পৃথিবীটা যেদিন চালু হয়ে গেল সেদিন কোন জ্যোতিষী ক্ষণটা খাতায় টুকে রেখেছিল? তাহলে শুভক্ষণ অশুভক্ষণ কল্পনা ছাড়া আর কি? আর যত গ্রহ নক্ষত্র, অপদেবতা, মাদুলী, শনি, সন্তোষীর প্রভাব শুধু এই হতভাগ্য-রোগ-শোক- -দারিদ্র্য-অজ্ঞ অশিক্ষার দেশেই। ইওরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার যে দেশগুলো স্বাস্থ্যে, শক্তিতে, শিক্ষায়, প্রাচুর্যে উজ্জ্বল, যে দেশগুলো দুধে, মাখনে, মাংসে ভাসছে, সেখানে এতো গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব নেই কেন? অদৃষ্ট বস্তু যিনি দেখে ফেলেছেন, তিনি হবেন নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ স্থিতধী পুরুষ। জ্যোতিষীদের

প্রসঙ্গ থাক। একটা গল্প শোনাই—

দু'জন ব্যবসায়ী একপাড়ায় বাস করত। একজন তিথি নক্ষত্র নিষ্ঠা সহকারে মেনে চলত, আর একজন ওসবের পরোয়াই করত না। পরোয়া না করা লোকটারই ব্যবসায় উন্নতি হচ্ছিল আর গ্রহ বিশ্বাসী লোকটার ব্যবসা খুব মন্দ যাচ্ছিল। একদিন যা হয় হবে বলে সে তিথি না দেখেই নৌকায় মাল নিয়ে যাত্রা করল। বিকেলে ঝড় উঠল নদীতে। তাড়াতাড়ি নৌকা ভেড়াতে গেল ডাঙ্গায়। দেখে ডাঙ্গায় দুটো কালো মোটা বীভৎস লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে দুটো কাঠের মুগুর। তাতে আবার কাঁটা কাঁটা সব কি লাগানো। বজ্রোজন আস্ফালন করছে। আয় বেটা নেমে আয়। তোকে দেখে নেব আজ। ব্যবসায়ী জোড় হাত করে বললে ঃ হুজুর আমার অপরাধটা কি? আর আপনারাই বা কে? কি আপনাদের পরিচয়?

আস্ফালনকারী বললে ঃ বেটা আমাদের চিনতে পারছিস না? আমি হচ্ছি অশ্লেষ্যা আর ওটা আমার ছোট ভাই মঘা। তুই তিথি না দেখে বেরলি কেন? আয় নেমে আয় তোকে দেখে নিচ্ছি। ব্যবসায়ীটা বলল, হুজুর আমিতো চিরকালই তিথিনক্ষত্র মেনে চলি, এই আজই প্রথম না দেখে বেরিয়েছি। আপনি আমাকেই চোটপাট করছেন, কিন্তু আমার প্রতিবেশী ব্যবসায়ী ও তো কোনদিন কিছু দেখে বেরয় না, ওর কি করছেন? অশ্লেষ্যা বলল, ওর আমি কি করতে পারি। ওতো আমাদের মানেই না। ওর কিছু করার মুরোদ আমার নেই। কিন্তু তুই তো মানিস। তুই বেরলি কেন বল।

গল্প এখানেই শেষ। সুতরাং যতদিন দুর্বলতা আছে অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা আছে ততদিন অশ্লেষ্যা মঘা আছে। পলা, গোমেদ, তামার আংটি, ঘোড়ার ক্ষুর আছে, জ্যোতিষী আছে। লটারীও আছে—চলবে। কারণ এদেশে যুক্তিবুদ্ধির আলোকে যারাই কিছু করতে এসেছেন মোটামুটি ব্যর্থ হয়েছেন।

তার প্রমাণ আজো সারাদেশে শহীদ ভগৎ সিং-এর অপেক্ষা কুস্তিবীর দারা সিং অনেক বেশি জনপ্রিয়।

একটি দেশের ভাবনা চিন্তা দেউলিয়া হয়ে গেলে ঠিক এই জিনিষ হয়। জীবনে কঠিন কঠোর নিষ্ঠুর বাস্তবের সে সম্মুখীন হতে পারে না। জীবনকে সে সংগ্রাম হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না কোনদিন। যুক্তিবুদ্ধি নয়, সে আশ্রয় নেয় কল্পনা, স্বপ্ন, ভক্তি আবেগের কাছে। বুদ্ধির জগতে এই তারল্য থেকে উঠে আসে শতশত দেবতা, গুরু, জ্যোতিষী, লটারী এবং অদৃশ্য নির্ভরতা। ফলে মস্তিষ্কটি ব্লাস্ট হয়ে যায়। স্থূলতা গ্রাস করে সারা সত্ত্বাকে। আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর আর প্রবৃত্তি সর্বস্ব হয়ে ওঠে জীবন। তাই এই ভঙ্গ বঙ্গেও রবিঠাকুরের চেয়ে শনিঠাকুরের প্রভাব অনেক বেশী। পাঁচুঠাকুরের প্রভাবও কম নয়। কারণ শনি ঠাকুর মানুষকে ভয় দেখাতে পারেন, পাঁচুঠাকুরের নামে পাওয়া যায় নানা রোগহর মাদুলি। রবিঠাকুর এসব কিছুই দিতে পারেন নি। তিনি যা দিয়েছেন তা ভয়হরণের মন্ত্র, কিন্তু তা একান্তই মস্তিষ্ক সাপেক্ষ। অহেতুকী ভয় বা ভক্তির ব্যাপার নয়। তিনি বলেছেন বুদ্ধির জায়গায় বিধিকে আর আত্মবিশ্বাসের জায়গায় ভগবদ বিশ্বাসকে বসিয়েই আমরা গন্ডগোলটা পাকিয়ে ফেলেছি। তিনি আরো বলেছেন, "বাইরে থেকে আমরা শুধু আঘাতই পেতে পারি, শক্তি পেতে পারি শুধু ভিতর থেকে।" কি দরকার এত বড় বড় কথায়। এসব বুঝতে গেলে মস্তিষ্ককে, প্রশান্ত বুদ্ধিকে সক্রিয় করা দরকার। এসবে বড় পরিশ্রম। তারচেয়ে শনির বাক্সে পাঁচটা পয়সা ফেলে তিনবার কানমূলে নেওয়া অনেক সহজ এবং নিরাপদ। অরিজিন্যাল মালটার কোন পরিবর্তন হয় না। সব অপরাধ করেও ভক্তিমান ভগবদবিশ্বাসী সাজা যায়। ভাবের ঘরে এই চুরিই আমাদের সব অগ্রগতির মূল বাধা।।

শিক্ষকদের জন্য

প্রাচীন দার্শনিক লাওৎসের লেখায় পড়েছি, ঈশ্বর যেন এক পলাতক আসামী। ভক্তরা ঢাক পিটিয়ে তার অনুসন্ধান করছেন। কথাটা নতুন করে মনে হলো চীনের প্রতিবেশী, "ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত" নামক দেশটার শিক্ষা ব্যবস্থা দেখে। বোধ হচ্ছে শিক্ষা যেন এখানে কোন ফেরারী আসামী। গভর্ণমেন্ট নানাভাবে তাকে ধরবার চেষ্টা করছেন, পারলেন না। কোন উর্দ্ধতন অফিসার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে নীচের তলার লোকেদের ক্রমাগত বদলী করে যুগপৎ মুখরক্ষা ও আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন, এদেশের সরকার ও শিক্ষাবিদেরা ঠিক তাই করে চলেছেন।

পদ্ধতি প্রকরণ পরিবর্ত্তন করছেন দশ থেকে এগারো, আবার দশ, পুনরায় এগারো বারো, আকস্মিকভাবে বৃত্তি পরীক্ষা নাশ, ইংরাজীর বিনাশ, সহজ পাঠের উচ্ছেদ বিচিত্র ইতিহাস। এ যেন সেই ডি, এল, রায়ের কবিতা—"নতুন কিছু করো, হয় পাহাড় থেকে পড়ো, নয় সাগরে দাও ডুব; মরবে না হয় মরবে কিন্তু নতুন হবে খুব।" শিক্ষা নামে আসামীটি নিরুদ্দেশ, কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা যেটা কফিনের মত চেপে রয়েছে ছাত্র-শিক্ষক-গার্জিয়ানদের ঘাড়ে, সেই কফিনে নিত্য নতুন পেরেক ঠোকার আনন্দে এদেশ মশগুল। এই দগ্ধ দেশের যে কোন বিদগ্ধ ব্যক্তি স্বীকার করবেন শুধুমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থায় ত্রুটীর জন্যই গোটা দেশটা একটা ক্রাইসিসের মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে। ক্রাইসিস অব মর‍্যালিটি, ক্রাইসিস অব সিভিলাইজেশন, ক্রাইসিস অব ক্যারেক্টার।

কোথাও কোন ওয়েসিস দেখা যাচ্ছে না। একটা জাতির মস্তিষ্ক হচ্ছে শিক্ষা। শিরে সর্পাঘাত হলে তাগা বাঁধা হবে কোথায়? একটা দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রী কিংবা ঘাগু কালোবাজারী অপেক্ষা বেশী ক্ষতি করার ক্ষমতা একজন

নিরীহ শিক্ষকের। ক্ষতি করছেনও। অধিকাংশ শিক্ষককে দেখা যায় কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত, দূর্নীতিপরায়ণ, ধূমপায়ী। রাজনীতি নিয়ে, মাইনে বাড়ানো নিয়ে যত ব্যস্ত, ছাত্রদের পঠন-পাঠনে ততোটাই অমনোযোগী। শিক্ষকদের পোষাক, আচরণ, ব্যক্তিগত জীবন কোনটাই ছাত্রদের কাছে অনুকরণযোগ্য নয়। অথচ আমরা সবাই জানি শিক্ষক বেণীমাধববাবু না থাকলে আমরা সুভাষকে নেতাজীরূপে পেতাম না। ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার না থাকলে "ইয়ং বেঙ্গল" আন্দোলনটাই হতো না। বাঙালীর যত অহংকার উনবিংশ শতাব্দীকে নিয়ে। উনিশ শতকের বেশীর ভাগ শিক্ষকই ছিলেন আদর্শবাদী।

আশুতোষ,বিদ্যাসাগর, নিবেদিতা, অরবিন্দ, অশ্বিনী দত্ত, সূর্য সেন সবাই ছিলেন শিক্ষক অথবা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। আজকাল ছাত্রদের সম্পর্কে অনেক বিশেষণ শোনা যায়। ষ্টুডেন্ট আনরেষ্ট। রাজনীতির শিকার। শ্রদ্ধাহীন, অবাধ্য ইত্যাদি। দুর্নীতিগ্রস্ত, টুকে পাশ করা, কুটিল, সুবিধেবাদী শিক্ষকদের হাতে তৈরী ছাত্রদের যা হওয়া উচিত তাই হচ্ছে। আনাড়ী মালীকে ফুল চাষের জন্য মাইনে দিলে কি হবে, সে আগাছা ফলাবেই। দেড়হাজারী প্রধান শিক্ষক মাত্র একশো টাকার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছেন নৈশ বিদ্যালয়ে। সরকারি কলেজের অধ্যাপক বেসরকারী বীমা কোম্পানীর একগোছা কাগজ নিয়ে তাড়া করে বেড়াচ্ছেন ছাত্রদের, এ দৃশ্য কখনো ছাত্রদের শ্রদ্ধা উদ্রেক করে না। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষককে যেভাবে দ্রুত পার্শ্ব পরিবর্তন করতে দেখা যায়, বীরাঙ্গনা শব্দটা একটু ভুল ছাপা হলে যাদের কথা বোঝায় তারাও এত দ্রুত ভাব পরিবর্তনে সক্ষম নয়। মিথ্যায়, প্রবঞ্চনায়, নীচতায় পরিপূর্ণ আজকের শিক্ষক সমাজ। শিক্ষা ব্যবস্থাটা যেখানে কফিনস্থ আর শিক্ষকেরা যেখানে সরীসৃপ সদৃশ বুকে হাঁটা প্রাণী সেখানে সমাজের

সর্বস্তরে বিশৃঙ্খলা থাকবেই। আজকাল যেভাবে স্কুল থেকে পাশ করাবার লোভ দেখিয়ে, কিংবা ফেল করাবার ভয় দেখিয়ে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করা হয় ছাত্রদের, তাতে শিক্ষকদের কসাই বললে কসাইদের ছোট করা হয়।

এক একজন শিক্ষিকার পোষাক দেখলে মনে হয় স্কুলে নয়, ফ্যাশন প্যারেডে এসেছেন। প্রার্থনার সময় বহু শিক্ষক দূরে দাঁড়িয়ে বিড়ি খান গল্প করেন। শিক্ষকারা অনেকে পড়াতে পড়াতে উল বোনেন। কেউ ক্রমাগত নখ খুঁটে বিরক্তি উৎপাদন করেন ছাত্রছাত্রীদের। অথচ এঁরাই বেসিক কিংবা বি-এড্ পড়তে গিয়ে মুখস্থ করেছেন, শিক্ষকদের কোন বদভ্যাস, কোন মুদ্রাদোষ থাকবে না। জানি, এই প্রবুদ্ধ লেখাটি পড়ে শিক্ষকেরা ক্রুদ্ধ হবেন, কিন্তু শুদ্ধ হবেন না। হাল্কা মানুষের মত আজকের শিক্ষক প্রশংসায় বিগলিত হন, নিন্দায় বিচলিত হন না। খুব ট্যান করা চামড়ার যেসব গুণ থাকে আর কি।

অথচ যাবতীয় সমস্যা সমাধানের বীজটা শিক্ষাতেই নিহিত— শিক্ষকদের ওপরই নির্ভরশীল। যেদিন থেকে শিক্ষক ভাববেন শিক্ষকতা বৃত্তি নয় ব্রত, প্রফেশন নয় মিশন, দিনগত পাপক্ষয় নয় একটি অপার সৃষ্টিকর্ম, সেদিন থেকেই অন্ধকার শিক্ষা জগতে জ্বলে উঠবে আলো। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' হয়ে উঠবে দেশ। শিক্ষক হৃদয়ে থাকবে বিশুদ্ধ সংস্কার সমূহের সমন্বয়। শিক্ষক যেন তেন প্রকারেণ অর্থ সংগ্রহে মনোযোগ দিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবেন না। তাঁর থাকবে একটা স্বতন্ত্র পরিচ্ছন্ন জীবন। তাঁর স্নিগ্ধ আচরণ, বিশুদ্ধ জীবন, হিরন্ময় দীপ্তি এনে দেবে তাঁকে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে সম্ভ্রমে, শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াবে মানুষ। সফল ছাত্রেরা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে পেরে ধন্য হবে। ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট কিংবা পাটের দালালের মানসিকতা কখনো শিক্ষকের মানসিকতা হতে পারে না।

আজকাল তাই হচ্ছে দেখেই ছাত্র অভিভাবক, শিক্ষককে একজন মুদী দোকানদারের চেয়ে বেশী মর্য্যাদা দেয় না। শিক্ষক জীবনের আদর্শ কখনই 'ইট ড্রিঙ্ক এ্যান্ড বি মেরী' হতে পারে না। শিক্ষক জীবনের আদর্শ হবে 'তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জিথা'। শরৎচন্দ্র বলেছেনঃ শিক্ষা মানে আমি বুঝি হৃদয়ের বিস্তার। স্বামিজী বলেছেন ঃ মানুষের ভেতরে যে পূর্ণতা সুপ্ত রয়েছে তাকে জাগানোই শিক্ষা। বিস্তৃত হৃদয়ের এই সুপ্ত পূর্ণতাকে জাগানোর দায়িত্ব যাদের, তাদের কি ঘুমিয়ে থাকলে চলে ? সরকার এবং শিক্ষাবিদেরা ঢাক বাজিয়ে খুঁজুন না পলাতক শিক্ষাকে, কিন্তু শিক্ষকেরা তাঁদের সামর্থ্য এবং সীমার মধ্যে গড়ে তুলুন একটি আদর্শ জীবন। নির্লোভি সচ্চরিত্র, স্বল্পে সন্তুষ্ট অথচ মেরুদন্ডহীন সরীসৃপ নয়, ঋজু বলিষ্ঠ একটা সম্পূর্ণ মানুষ। যার কাছে গেলেই মনে হবে একটা গোটা মানুষের কাছে এসেছি, অজস্র অতৃপ্ত চাহিদা যে মানুষটার কাছে লজ্জায় আসতে সাহস পায়নি। যে মানুষটাকে দেখলেই মনে হবে দরিদ্র কিন্তু লোভী নয়। বিনীত কিন্তু দুর্বল নয়। আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ আত্মপ্রচারে উদাসীন। যাঁরা জাতির মেরুদন্ড, মানুষ গড়ার কারিগর বিশেষণে ভূষিত, তাঁদের চেহারা, চরিত্র, আচরণ, ভঙ্গীতে, ভাষায় থাকবে একটি গোটা মানুষের প্রতিচ্ছবি। যাঁদের সোনার কাঠির স্পর্শে জেগে উঠবে অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার আর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির অন্ধকারে আচ্ছন্ন ঘুমন্ত জাতি। এদেশের শিক্ষকদের কাছে এ প্রত্যাশা আকস্মিক নয়। উনিশ শতক তার জ্বলন্ত প্রমাণ। সেই শিক্ষক চাই। যার হাতে তৈরী হবে না ভন্ড ধার্মিক, দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদ, ভেজালদার ব্যবসায়ী, চপল সাহিত্যকার, হাস্যকর কবি, ছাত্র নামের অযোগ্য যুবক। সরকার এবং সমাজের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে নিজেকে নির্দোষ ভাবার মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে শিক্ষক সমাজ একটু অর্ন্তমুখী হবেন কি ? আদর্শ শিক্ষক হবার স্বর্গীয় আনন্দে

যদি একটা জেনারেশান ত্যাগ স্বীকার করা যায়, ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন হবে। বিশ্বের মানুষ খুঁজে খুঁজে একদিন নালন্দায় আসত, তক্ষশীলায় আসত, তেমনি আবার ছুটে আসবে। সকল স্বপ্ন সফলের চাবিকাঠি আছে শুধুমাত্র শিক্ষকদেরই হাতে। এই শিক্ষকদের একটা ঘোরতর অগ্নিসমীক্ষা দরকার।

মার্ক্সবাদ এবং মানবতা

আটত্রিশ বছর বয়সে জাঁ জাক রুশো এক জবরদস্ত প্রবন্ধ লিখলেন একটি প্রতিযোগিতায়। বিষয়— বিজ্ঞান, শিল্প এবং সাহিত্য মানুষের কোন কল্যাণ করেছে কি না। রুশো লিখলেন, মানুষের বিকৃতির মূল কারণ—শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান। মানুষ মূলতঃ সরল, নিষ্পাপ। কিন্তু শিল্প তাকে করেছে ভোগস্পৃহ, বিজ্ঞান তাকে করেছে অতৃপ্ত আর সাহিত্য তাকে শিখিয়েছে সোজা কথাগুলো ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলতে। শিক্ষার প্রথম বলি সারল্য। সভ্যতার কাজ হলো মানুষের প্রয়োজন বৈচিত্র্য বাড়িয়ে স্বল্পে তার যে তৃপ্তি তা নষ্ট করা। আদিম মানুষই স্বাধীন মানুষ। সংস্কৃতির মধ্যে স্বাধীনতার বিকাশ নয় বিনাশ ঘটে। প্রতিযোগিতায় রুশোর পুরস্কার মিললো। তিনি লিখে চললেন, প্রকৃতির ওপর খোদকারী করতে গিয়েই মানুষ যত দ্বন্দ্ব আর সমস্যার সৃষ্টি করেছে। শরায়ুধ ছেড়ে যেদিন সে হল হলায়ুধ, সেদিন থেকেই তার ভাগ্য বিপর্য্যয় শুরু। তারপর ধাতুর আবিষ্কার সর্বনাশের বনিয়াদকে পাকা-পোক্ত করে বাঁধল। গোষ্ঠী জীবনের ঐক্য ভেঙেচুরে দেখা দিল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের চেতনা। রুশো লিখলেন ঃ যদি এই পতন থেকে উদ্ধার পেতে হয়, তবে মানুষকে সভ্যতার আমূল উচ্ছেদ ঘটিয়ে আদিম দশায় ফিরে যেতে হবে। কিন্তু হাজার সভ্যতা বিমুখ লেখকেরও শুধু লিখে তৃপ্তি নেই। জ্ঞানী-গুণীদের তারিফ পাবার লোভটুকুও আছে। রুশো তাঁর সব লেখার কপি ভোলতেয়ারের কাছে পাঠালেন। সব পড়ে ভোলতেয়ার লিখলেন, কি লিখলেন তার আগে একটু অন্য প্রসঙ্গের আলোচনা করে নিই। মাঝে মাঝে মানুষের সমাজকে আদিম বর্বর প্রাচীনতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু মানুষ অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার প্রয়োগ করে থাকেন।

সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর মানুষকে আবার আদিম যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুপরিকল্পিত আন্দোলন চলেছে। মধ্যবিত্ত ঘরের এক সন্তান ইহুদী পরিবারে জন্মে জার্মানীতে বড় হয়ে লন্ডনে এক খবরের কাগজে চাকরী করছিলেন। কয়েকটা পাউন্ড বেশী চেয়েছিলেন, পাননি। রাতে এসে লিখে ফেললেন কম্যুনিষ্ট মেনিফেষ্টো। তারপর দাস ক্যাপিটাল এবং আরো কিছু জঞ্জাল। যার নাম মার্ক্সবাদ। কয়েকটা পাউন্ড না পাওয়ার প্রতিক্রিয়া যার উপজীব্য। মধ্যযুগের কোরাণের পরিবর্তে এই গ্রন্থগুলো বগলে নিয়ে নতুন দিনের সৈনিকেরা বেরিয়ে পড়ছে নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন নিয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ওদের প্রচারের হাতিয়াররূপে কাজ করছে। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্ররা মার খেয়েছে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র সোভিয়েট, পূর্ব ইউরোপে তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। সাধারণ মানুষ সাফল্য দিয়েই ভালমন্দ বিচার করে থাকে। এছাড়া এই তন্ত্রের যাঁরা প্রবক্তা তাঁরা সমাজ-দর্শনে বর্বরতার সঙ্গে মানবতার কিছুটা খাদ মিশিয়ে ছিলেন। তাঁদের যুক্তি হলো যে, যদিও মানবতার প্রতিষ্ঠাই কম্যুনিজমের উদ্দেশ্য, কিন্তু উপায় হিসাবে আদিম বর্বরতা অবশ্যম্ভাবী। উপায় যে কিভাবে উদ্দেশ্যকে বিপর্যস্ত করে কম্যুনিষ্টদের ক্রিয়াকলাপে তার বিস্তর উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও প্রচুর বুদ্ধিমান লোক আজও সে কথা হৃদয়ঙ্গম করেন নি। মানবতন্ত্রের ছদ্মবেশে চতুর বর্বরতন্ত্র তাদের সহজে ধোঁকা দিতে পেরেছে। মনুষ্যত্বের যে বিকাশ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চেতনার অঙ্গীভূত, এদের কাছে তার কোন মূল্য নেই। ব্যক্তি মানুষের জীবনে পরিপূর্ণ তিনটি স্তর আছে— ব্যষ্টি, সমষ্টি ও পরমেষ্ঠী জীবন। এই আদিম দর্শনে ব্যষ্টি ও পরমেষ্ঠী সত্ত্বাকে নিষ্ঠুরভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। যে সমষ্টি সত্ত্বার কাছে মানবজীবনের দুটি গুরত্বপূর্ণ খন্ডকে বলি দিচ্ছে তার নাম শ্রেণী। প্রতি ব্যক্তির ভাবনা, চিন্তা, আবেগ, অনুভূতি, ক্রিয়াকলাপ নাকি তার শ্রেণী সত্ত্বা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কম্যুনিজমের পুরো প্রতিষ্ঠা যতদিন না ঘটে ততদিন পর্য্যন্ত সমাজে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণী বিদ্যমান থাকবে।

একটি সমষ্টি উন্নয়নের প্রতিভূ। অন্যটি বিরোধী। সমাজের অবস্থা ভেদে শ্রেণীদের উপাদান বদলায়, কিন্তু চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে না। আধুনিককালে এই দুই শ্রেণীব নাম- পুঁজিপতি ও মজুর। সমাজে যে সমস্ত ব্যক্তি সম্প্রদায় আজও সুস্পষ্ট এই দুই শ্রেণীর কোনটির অন্তর্ভুক্ত নয়, তারা হয় এই শ্রেণী সংঘাতের চাপে লুপ্ত হবে, নয়তো তাদের টিকে থাকার প্রয়োজনেই এই দু'শ্রেণীর একটি না একটিতে আশ্রয় নিতে হবে। সেক্ষেত্রে যে শ্রেণী সমষ্টিস্বার্থের প্রতিভূ তার দেহে বিলীন হওয়াই বুদ্ধিমত্তা। কারণ কম্যুনিষ্ট জ্যোতিষীদের মতে উক্ত শ্রেণীর জয় অবশ্যম্ভাবী। কম্যুনিষ্ট দর্শনে ঐতিহাসিক নিয়তিতে বিশ্বাস সমষ্টির কছে ব্যক্তির আত্মসমর্পণ সহজতর করেছে। কম্যুনিষ্ট মতে নিয়তিকে সচেতনভাবে মেনে নেওয়াই হল স্বাধীনতা। কম্যুনিষ্ট নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী মানুষের মধ্যে শনি দুই ছিদ্রপথে প্রবেশ করে। প্রথম—ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, চেতনা, দ্বিতীয়—প্রশ্নশীল বুদ্ধি। এই দুই ছিদ্র পথকে অং, বিশ্বাসের সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করাই হল কম্যুনিষ্ট নির্বোধতন্ত্রের শিক্ষা পদ্ধতির মূলকথা। কম্যুনিষ্ট মাত্রেরই বিশ্বাস, ব্যক্তি ভুল করতে পারে । পার্টির ভুল অকল্পনীয়। কারণ যে শ্রেণীর স্বপক্ষে ইতিহাস, পার্টিতো তারই প্রতিভূ। পূর্ব জার্মানীর নাট্যকার ব্রেখটের ভাষায়—

One man has two eyes the party has thousand eyes. The party overlooks seven states one man sees one city. One man has his hour. But the party has many hours. One man can die, But the party cannot be killed.

রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের আগে পর্য্যন্ত পার্টি প্রচার ও সংগঠন মারফৎ প্রতি সদস্যের বিবেক এবং বিচারশক্তিকে বিলুপ্ত করার চেষ্টা করে। কি প্রক্রিয়াতে ব্যক্তি মানুষ এভাবে নির্বোধ দাসে পরিণত হয়, তার অনেক বিবরণ প্রাক্তন

কম্যুনিস্টরা লিখে গেছেন। পার্টি যখন ক্ষমতায় আসে তখন সমগ্র সমাজকে সে এই নির্বোধ আর বর্বর তন্ত্রের অঙ্গীভূত করে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস থেকে শুরু করে উৎপাদন, বন্টন, নির্বাচন, পারিবারিক সম্পর্ক, শিক্ষা সবকিছুই তখন নিয়ন্ত্রিত— সে রাষ্ট্র থেকে প্রেম ও সৃষ্টি নির্বাসিত। স্বাধীন চিন্তা নিষিদ্ধ, বৈচিত্র্য অবলুপ্ত, সেখানে স্বাতন্ত্র্যের শাস্তি মৃত্যু। এই বর্বরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গেলেই সে সভ্যতার বিরোধী। নয়া সমাজের শত্রু। ইতিাসের জড়বাদী ব্যাখ্যাকে মানবজাতির বিরুদ্ধে এমন সুকৌশলে প্রয়োগের চেষ্টা ইতিপূর্বে হয়েছে কিনা জানা নেই। কিন্তু আদিম বর্বরতার নির্বুদ্ধিতাময় পথ পেরিয়ে সভ্যতার রথ আজ অনেকখানি এগিছে। ব্যক্তি ভাবনার যে স্তরে আজ মানব সমাজ উপনীত, সেখান থেকে গোষ্ঠী জীবনে, আরণ্যক জীবনে ফিরে যাওয়া কি সম্ভব? রুশোর পাঠানো রচনার উত্তরে ভোলতেয়ার লিখেছিলেন, প্রিয় মিঃ রুশো, আপনার লেখাগুলো মনোযোগ সহকারে পড়লাম। মানব সভ্যতাকে এতো চাতুর্য্য এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে আক্রমণ, হাতিপূর্বে কেউ করতে পারেনি। আপনার লেখা পড়ে আমার বারবার ইচ্ছে হয়েছিল হামাগুড়ি দিই, কিন্তু পারলাম না। কারণ সে অভ্যাস ষাট বছর আগে আমি হারিয়েছি। আর সে অভ্যাসে ফেরা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অর্থাৎ ভোলতেয়ার বলতে চেয়েছিলেন, মানুষের সভ্যতার রথ আজ অনেক পথ অতিক্রান্ত, কোনভাবেই তাকে আর আদিম আরণ্যক বর্বর জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে না। কিন্তু মানুষের ইতিহাসের ট্র্যাজেডি এই যে বাববার তাকে মুক্তির নামে শৃঙ্খল পরানোর চেষ্টা হয়েছে, হয় এবং হবে। ধর্মের নামে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে এবং পৃথিবীর অনেকটা অংশে এখনো মধ্যযুগের প্রচ্ছায়া। কানাগলির দু'একটি মুখে ঘুরে বেড়ানোকেই বহু মানুষ পথ চলার আনন্দ মনে করছে। একদল মানুষ তাদের সে কথাই

বিশ্বাসে বাধ্য করছে। অর্থনৈতিক মুক্তির নামে এসেছে মার্ক্সবাদ— আধুনিকতম বর্বরতন্ত্র। মানুষ স্বাধীনতা চাইবেই। কাজেই যে মার্ক্সবাদকে ইসলামকে আজ মনে হচ্ছে জব্বলপুরের গ্রাণাইট পাথরের দুর্গ, তাসের ঘরের মতো তা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে একদিন। সহস্র যুক্তি এবং সঙ্গে কামান বন্দুক দিয়েও তাকে রক্ষা করা যাবে না। তারই প্রতিফলন হচ্ছে ইওরোপের রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে। প্রশ্নশীল বুদ্ধিদীপ্ত স্বাধীনচেতা মানুষ বুঝতে পারছে মার্ক্সবাদ মানবতার পক্ষে এক বিপজ্জনক তত্ত্ব।

প্রকাশকের কথা

সরস এবং সিরিয়াস চারটি রচনার সংকলন, "চতুর্ব্বর্গ"। লেখাগুলি ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ও প্রশংসিত। স্বাদে ও গন্ধে ভিন্নতর হলেও এর লেখকের পরিচিত চরিত্র চিনতে অসুবিধা হয় না। যিনি অপ্রয়োজনের আনন্দরূপে পরিস্থিতি নিরপেক্ষ কিছু লেখেন না। যাঁর লেখায় সময়, সমস্যা এবং সমাজ সচেতনভাবে বিধৃত। তাই এই লেখকের ছোট ছোট কিন্তু তীব্র লেখাগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক বিরাট পাঠক সমাজ। নানা ভাষায়, ঈর্ষণীয় সংখ্যায় এবং দেশের দিগন্ত অতিক্রমকারী জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও আমরা জানি এই ধরনের লেখা কিছু মানুষকে যন্ত্রণা দেয়, ব্যথা দেয়। আমরা মনে করি শিবপ্রসাদ রায়ের লেখা মৃতের ময়না তদন্ত নয় যে কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। শ্রীরায়ের লেখা জীবিতের শল্য চিকিৎসা, একটু একটু লাগতেই পারে। সেটা কিন্তু আরোগ্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই। এই পুস্তিকার শেষ প্রবন্ধটি লেখক ১৯৬০ সালে লিখেছিলেন। বিষয় মার্ক্সবাদ। মার্ক্সবাদের অন্তঃসারশূন্যতা ও মানবতাবিরোধী ভূমিকা তখনই ধরা পড়েছিল তাঁর দৃষ্টি দর্পণে। নানা লেখায় তিনি তখনই সতর্ক করেছিলেন এই রাজনৈতিক অন্ধত্বকে। যৌবনের অসামান্য অপচয় এবং মানব সমাজকে নিয়ে জুয়া খেলার ফল আজ প্রকটিত। রাশিয়া সম্পর্কে ছোট নিটোল রচনাটি তত্ত্বগত দিক থেকে হীরকখন্ড তুল্য। প্রবল জনপ্রিয়তা আমাদের বিশেষণের সত্যতা প্রমাণ করেছে। এই নতুন সংস্করণটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

তপন কুমার ঘোষ